সমকাল

তারিখ 16 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৩

তাহলে পাঠ্যবইয়ের কী দরকার!

সময়ের কথা | অজয় দাশগুপ্ত

সাংবাদিক

স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বিকল্প হয়ে উঠেছে গাইড বই, শ্রেণিকক্ষের বিকল্প হয়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। একজন প্রধান শিক্ষক ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন রাখলেন– তাহলে পাঠ্যবইয়েরই-বা দরকার কী? স্কুলেরই-বা দরকার কী? তিনি আরও বলেন, পাঠ্যবই মিলছে বিনামূল্যে। কিন্তু এ বই কিনতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে যে অর্থ ব্যয় করতে হতো, তার চেয়ে বেশি ব্যয় হয় গাইড বই কিনতে। বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য যে অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি ব্যয় হয় কোচিং সেন্টারে পড়ার জন্য। এ যেন বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এ কোচিং সেন্টার বিদ্যালয়ের ভেতরে হতে পারে, বাইরে হতে পারে। কোচিং সেন্টার স্কুলের বাইরে হলে সেখানে যাতায়াত ব্যয় আছে। একাধিক সেন্টারে যেতে হলে ব্যয় পড়ে আরও বেশি। তাহলে কোথায় চলেছে আমাদের স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা?

একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি। তিনি বলেন, সরকার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াচ্ছে। যদিও এ বরাদ্দ যুগের চাহিদার তুলনায় কম; কিন্তু এটাও তো মানতে হবে যে, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সম্প্রতি বাড়িয়ে আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। সরকার থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে নাইন (নবম ও দশম শ্রেণিতে একই বই পড়ানো হয়) পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই দিচ্ছে বিনামূল্যে। বিদ্যালয় ভবন তৈরি করে দিচ্ছে সরকার। বিজ্ঞান গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় ভবন সংস্কার– এসব খাতেও সরকারের ভাণ্ডার থেকে অর্থ মিলছে। এসব সুবিধার বিনিময়ে প্রত্যাশা করা হয় যে, পড়াশোনার মান ক্রমান্বয়ে ভালো হতে থাকবে। স্কুলগুলোতে আরও ভালোভাবে পাঠদান করা হবে। কিন্তু কোচিং সেন্টার ও গাইড বইয়ের ওপর যে নির্ভরতা তাতে তো মনে হচ্ছে স্কুল শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের গলদ রয়ে যাচ্ছে।

এবার আমার অভিজ্ঞতা বলি। সম্প্রতি গ্রামের একটি লাইব্রেরি বা বই-খাতার দোকানে যেতে হয়েছিল। পাশেই দুটি স্কুল– একটি কো-এডুকেশন এবং আরেকটি কেবল মেয়েদের। কো-এডুকেশনের স্কুলটি এক সময় শুধু ছেলেদের জন্য ছিল। কিন্তু সরকার যেহেতু দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতনের অংশ দিচ্ছে, এ কারণে ছেলেদের বিদ্যালয়টি ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের যুক্তি স্পষ্ট– ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন আদায় করায় অনেক সমস্যা। কিছু শিক্ষার্থী বেতন দিতে চায় না। কেউ কেউ বেতন মওকুফের ব্যবস্থাও করে নেয়। কিন্তু ছাত্রীদের স্কুলে বিনাবেতনে পড়ানো হলেও বেতনের সমপরিমাণ অংশ দিয়ে দেয় সরকার এবং তার শতভাগ প্রাপ্তি নিশ্চিত। অতএব, স্কুল উন্মুক্ত হয়েছে ছাত্রীদের জন্য। নারী শিক্ষার প্রসারের চেয়েও এ ক্ষেত্রে বেশি কাজ করেছে বাণিজ্য!

বাণিজ্যের প্রশ্নেই এখন বলি। যে লাইব্রেরি বা বই-খাতার দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ চোখ গেল একটি তাকের দিকে– যেখানে সাজানো ছিল গাইড বই। বিক্রেতা বলেন, ষষ্ঠ শ্রেণির গাইড বইয়ের একটি সেটের দাম পড়ে ৬০০ টাকা। বইয়ে দাম লেখা আছে আরও বেশি– তা থেকে ৩৫ শতাংশ কম রাখা হয়। সপ্তম শ্রেণির গাইড বইয়ের এক সেটের দাম পড়ে ৬৫০ টাকা। অষ্টম শ্রেণির সেট ৮৫০ টাকা। নবম ও দশম শ্রেণির সেট তিন ধরনের– মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য দুই হাজার ৫০০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগের জন্য সেট সাড়ে তিন হাজার টাকা।

আমি এ তথ্য নিয়ে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলি। তারা বলেন, নবম শ্রেণিতে ওঠার পর প্রায় সব ছাত্রছাত্রী গাইড বই কেনে। কেউ কেউ একাধিক প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত একাধিক সেট কেনে। একজন শিক্ষক জানালেন, তাদের স্কুল থেকে এ বছর ৩০০ ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের সবাই গাইড বই কিনেছে। আমি হিসাব কষতে বসি। এ বছর (২০১৭) মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় ১৯ লাখ ছাত্রছাত্রী। বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়েছে; কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য মনোনীত

স্কুলে বিনামূল্যে মিলছে পাঠ্যবই। কিন্তু গাইড বই কিনতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক

হয়নি এমন একদল ছাত্রছাত্রী রয়েছে, যাদের কেউ অভিহিত করেন 'খারাপ' হিসেবে, কেউবা বলেন 'অমনোযোগী'। কেউ হয়তো বলবেন– 'মাধ্যমিক পরীক্ষার 'অনুপযুক্ত।' তবে তারাও গাইড বই কিনেছেন। অনেকে কোচিং সেন্টারে গিয়ে অর্থদণ্ড দিয়েছেন। সব মিলিয়ে ধরে নিতে পারি যে, এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হিসেবে যাদের বাছাই করা হয়েছে তারা ২০১৫ সালে নবম শ্রেণিতে উঠেছিল। এটাও ধরে নিতে পারি যে, তাদের সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ। এরা বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের জন্য প্রকাশ করা গাইড বই কিনেছে। প্রতি সেট গাইড বইয়ের দাম আড়াই হাজার ও সাড়ে তিন হাজার টাকা। ধরে নিই যে, গড়ে দাম পড়েছে প্রতি সেট তিন হাজার টাকা। তাহলে ২৫ লাখ ছাত্রছাত্রী গাইড বই কিনেছে ২৫০০০০০x৩০০০ টাকা = ৭৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কেবল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যদি এক সেট করে গাইড বই কেনে, তাহলে এর বাজার রয়েছে ৭৫০ কোটি টাকার। এই ২৫ লাখ ছাত্রছাত্রীর ২০ শতাংশও যদি দুই প্রকাশকের কাছ থেকে গাইড বই কেনে, তাহলে আরও দেড়শ' কোটি টাকা। মোট ৭৫০+১৫০ = ৯০০ কোটি টাকা। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম– এই তিন শ্রেণিতে আরও অন্তত এক কোটি ছাত্রছাত্রী পড়ছে। তাদের প্রতি সেট গাইড বইয়ের দাম ৬০০ থেকে ৮৫০ টাকা। ধরে নিতে পারি যে, গড়ে প্রতি সেট গাইড বই তারা কেনে ৭০০ টাকায়। তাহলে এই তিন শ্রেণির এক কোটি ছাত্রছাত্রী গাইড বই কেনা বাবদ ব্যয় করে ৭০০ কোটি টাকা। কেউ বলতে পারে– নিচের ক্লাসের সবাই গাইড বই কেনে না। আমরা ধরে নিই– ৫০০ কোটি টাকার গাইড বই কেনে এসব ছাত্রছাত্রী। তাহলে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবইয়ের বাইরে গাইড বই কেনা বাবদ বছরে ব্যয় করে ৯০০ + ৫০০ = ১৪০০ কোটি টাকা। যেসব শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে গাইড বই নিয়ে কথা বলেছি, তারা জানালেন– প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতেও গাইড বই রয়েছে। সরকার এ বছর প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রকাশ করেছে ৩৬ কোটি। এ জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। পাঠ্যবই প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত একজন সরকারি অফিসার আমাকে গত ডিসেম্বর মাসে বলেছেন, ষষ্ঠ শ্রেণির ১৪টি বইয়ের এক সেট বেসরকারি বাজার থেকে কিনতে হলে অন্তত ২১শ' টাকা খরচ পড়ত। কিন্তু সরকার তা নিজ ব্যয়ে ছাপিয়ে বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করছে এবং এ জন্য ব্যয় পড়ছে প্রতি সেটের জন্য মাত্র ২৮০ টাকা। বইয়ের ব্যবসায় যে বড়ই লাভ! কিন্তু বুদ্ধি থাকলে যে ঢেউ গুণেও আয় করা যায়। সরকার পাঠ্যবই নিয়ে প্রকাশকদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিতে হবে? 'বুদ্ধিমান' লোকেরা সেটা করতেই পারে না। তারা পাঠ্যবইয়ের বাজার হারিয়ে আরও লাভজনক ব্যবসায়ে মনোযোগী হয়েছে– নোট ও গাইড বই প্রকাশ এবং তার বাজার তো আরও বড়! এ বাজার ধরার জন্য প্রকাশকরা স্কুলে স্কুলে কর্মী পাঠান। যশোরের একজন শিক্ষক বলেন, ওষুধ কোম্পানিগুলো যেমন চিকিৎসকদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিতে রিপ্রেজেনটেটিভ পাঠায়, তেমনি গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীরাও পাঠান। তারা গাইড বই গছানোর জন্য শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের একটি অংশকে ম্যানেজ করে। শিক্ষকদের একটি অংশের কাছে গাইড বইয়ের আরও একটি কারণে কদর রয়েছে– এতে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকে। এ কারণে শ্রেণিকক্ষের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে বেশি কষ্ট করতে হয় না।

এ লেখা তৈরি করতে গিয়ে যতজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের বেশিরভাগ বলেছেন– পাঠ্যবইয়ের বিকল্প নেই। এখন মাধ্যমিক কিংবা অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে তাতে পাঠ্যবই পড়তেই হবে। যত গাইড বই কেনা ও গলাধঃকরণ হোক না কেন, সব প্রশ্নের উত্তর তাতে মিলবে না। তারা আরও বলেন, সরকার থেকে শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দায়িত্ব থাকে অন্য শিক্ষকদের তাদের অর্জিত জ্ঞান অবহিত করা। কিন্তু বাস্তবে যে 'নিষিদ্ধ' পণ্যের তালিকায় থাকা গাইড বই 'সর্বরোগহর' দাওয়াই হয়ে উঠেছে। কে এ দাপট রুখবে?

প্রশ্ন স্বাভাবিক– কীভাবে গাইড বইয়ের দাপট চলতে পারছে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায়। সরকার যখন সরকারি অফিসার ও কর্মীদের বেতন-ভাতা গড়ে প্রায় দ্বিগুণ করে দেয়, তখন শিক্ষকদেরও এ সুবিধা প্রদান করা হয়। এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কর্মজীবনের শুরুতে প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকারও বেশি বেতন তুলতে পারেন। অনেক শিক্ষাবিদের ধারণা, এ বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রছাত্রীরা স্কুলশিক্ষক হিসেবে চাকরি করতে তেমন উৎসাহী হবে না। কারণ এ পরিমাণ বেতন সরকারি অফিসের কেরানিদের প্রায় সমান কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম। শিক্ষকদের এই বেতন কাঠামো নিয়ে সরকারকে অবশ্যই ভাবতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন নিয়ে দ্রুত একটি সিদ্ধান্তে আসতেই হবে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই এ বিষয়ে একমত– স্কুল শিক্ষার জন্য সরকার যত বেশি বরাদ্দ দিচ্ছে, তত বেশি স্কুল ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হতে মরিয়া হয়ে উঠছে একদল অসৎ লোক। এ সুবিধা ভোগ করার জন্য তারা শাসক দলের এবং বিশেষ করে এমপি সাহেবের লোক হয়ে যেতে মুহূর্ত দেরি করে না। কিন্তু তাতে যে শিক্ষায় এত বিপুল বিনিয়োগ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে না। তৃতীয়ত, বই নিয়ে ফাটকা ব্যবসায়ে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে। 'নিষিদ্ধ' নোট ও গাইড বই যেন নিষিদ্ধ হেরোইন ও ইয়াবার মতো সর্বত্র সহজলভ্য না হয়। আমরা জানি, মাদক ব্যবসায় একটি ভয়ঙ্কর চক্র সক্রিয়। নোট-গাইড বইও কিন্তু ইয়াবার মতো ভয়ঙ্কর পণ্য হয়ে উঠেছে!

গাইড বইয়ের এ দাপট চলতে থাকলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মতো বড় অর্জন কিন্তু বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। আমাদের এখন পাঁচ কোটির বেশি ছাত্রছাত্রী। তারা 'পাস' করছে, অনেকে 'ভালো ফল' করছে। কিন্তু জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকছে ন্যূনতম চাহিদার তুলনায় কম। তারা শ্রমবাজারে যাবে, কিন্তু সার্টিফিকেটে যা মান লেখা তার তুলনায় দিতে পারবে অনেক কম। দেশের অর্থনীতির আকার বড় হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ্য লোকের চাহিদা বাড়ছে। অনেক প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বলা শুরু করেছে– চাকরির বিজ্ঞপ্তি দিলে অনেক অনেক আবেদন পড়ে। কিন্তু মানসম্পন্ন বা উপযুক্ত কর্মী কমই মেলে! আমরা কি এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবব না?

ajoydg@gmail.com